জীবননান্দ দাশ

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–২

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–৩

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–৪

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–৫

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–৬

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–৭

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–৮

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–৯

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প–১০

জীবননান্দ দাশ

শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প

দি স্কাই পাবলিশার্স
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল : জুলাই ২০২৪

জীবননান্দ দাশ শ্রেষ্ঠ কিশোর গল্প

প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

© লেখক

ISBN 978–984-96087–3–8

প্রকাশনায় : কথা সম্ভার, ৩৮/২-ক বাংলাবাজার
মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৯২৫-৭৬০৭৬৬
E-mail : kathasambhar@yahoo.com

বর্ণবিন্যাস : সূচনা কম্পিউটার্স, ৪০/৪১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
E-mail : suchana40@yahoo.com / suchana48@gmail.com

মুদ্রণ : আল ফয়সাল প্রিন্টিং প্রেস, ৩৪ শ্রীশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

গল্পক্রম

আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস / ৭
ছায়ানট / ১৬
মেয়ে মানুষ / ২২
হিশেব-নিকেশ / ৩৫
পালিয়ে যেতে /৪৭
রক্তমাংসহীন /৬৪
সঙ্গ, নিঃসঙ্গ / ৭৪
গ্রাম ও শহরের গল্প / ৮২
বিলাশ / ১০০
কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময় / ১১৯
শাড়ি / ১৩১
নষ্ট প্রেমের কথা / ১৩৮
জাদুর দেশ / ১৫০

আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস

শুভেন্দু উঁকি দিয়ে বললে, ঢুকতে পারি কি প্রমথ?'

কল্যাণী বললে, 'আসুন-'

প্রমথ অবাক হয়ে তাকালে।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে শুভেন্দু বললে, 'অমন হাঁ করে থাকার কিছু নেই–' ভাবছ কল্যাণীকে আমি চিনলাম কী করে? তা চিনি হে চিনি–দুনিয়ার নানারকম জিনিসও হয়ে যায়।'

হাসতে-হাসতে আঙুল বুলিয়ে গোঁফজোড়া সাজিয়ে নিয়ে বললে, 'আগে একে মিস গুপ্ত বলে ডাকতাম–শেষবার যখন দেখা হয়েছিল তখনো, কিন্তু এখন নাম ধরেই ডেকে ফেললাম, ডাকা উচিত, আলাপ আমাদের নিশ্চয়ই এমন ঘনিষ্ঠতায় পৌঁছেছে', বলতে-বলতে শুভেন্দু থেমে গেল।

কেউ কোনো কথা বলল না।

শুভেন্দু বললে, 'তুমি রাগ কর নি কল্যাণী?'

কল্যাণী মাথা হেঁট করে ছিল।

মুখ তুলে শুভেন্দুর দিকে একবার তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল।

শুভেন্দু বললে, 'কল্যাণী যে বিরক্ত হবে না তা আমি জানতাম–কিন্তু কেউ-কেউ হয়–তাদের সঙ্গে আমিও অত গা মাখামাখি করতে যাই না। বয়ে গেছে আমার; মানুষ আমি চিনি হে প্রমথ, যারা বেশি-বেশি ভদ্রতা ও সামাজিকতার ভান করে, না আছে নিজেদের ভিতরে তাদের কোনো অন্তঃসার, না আছে পরের প্রতি কোনো–'

শুভেন্দু থেমে গিয়ে দু জনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কল্যাণীর চেয়ে আমি ছ বছরের বড়।'

কল্যাণী ঈষৎ লজ্জিত হয়ে হেসে বললে, 'কৈফিয়তই তো দিচ্ছেন এসে অব্দি–কিন্তু আমরা তো কেউ চাই নি তা আপনার কাছ থেকে; আপনি ভাল হয়ে বসুন, কেমন আছেন বলুন, অনেক দিন পরে দেখা হল সত্যি, সেই–'

একটু থেমে নিয়ে সে বললে, 'একে তুমি তো খুব চেন প্রমথদা?'

শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু কল্যাণীকে আমি কি করে অতখানি চিনে ফেললাম সেইটেতে তোমার খটকা বাধে হয় তো প্রমথ।'

কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু প্রমথের সঙ্গে তোমার একদিনের আলাপ এত খানি? এও তো এক আশ্চর্য!'

কল্যাণী–'আপনার সঙ্গে সাত-আট দিনের পরিচয় শুভেন্দুবাবু। কিন্তু প্রমথদাকে সাত-আট বছরের বেশি–'

শুভেন্দু কল্যাণীকে কেটে দিয়ে স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'সাত-আট বছর! বল কি হে প্রমথ।'

'একটু পরে হেসে বললে, 'তা হলে একে সেই ফ্রক পরার সময় থেকে দেখে আসছ।'

থেমে আবার হেসে বললে, 'বেশ, বেশ! কিন্তু প্রমথর কথা আমাকে তুমি বল নি তো কল্যাণী।'

–'আপনাকে আমি কার কথাই বা বলেছি, ক দিনই বা আলাপ আমাদের।'

–'কিন্তু প্রমথর কথা উঠতে পারত না কি? আমাদের দু-জনেরই এমন চেনা মানুষটা।'

সকলেই চুপ করে রইল।

কল্যাণী বললে, 'এর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ জান প্রমথদা?'

শুভেন্দু বললে, 'তাও জানাও নি প্রমথকে? তোমরা দু-জনেই তো জানতে যে প্রমথর বিয়েতে আমি আসছি অথচ আমার সম্বন্ধে তোমাদের দু-জনের ভিতরে একবারও কথা হয় নি?'

শুভেন্দু খুব অবাক হয়ে পড়ছে।

প্রমথও বিস্মিত হয়ে কল্যাণীর দিকে তাকাচ্ছে।

বাস্তবিক, শুভেন্দুর সাথে তার এত যে পরিচয়, শুভেন্দুবাবু যে তাকে চিঠিও লেখেন একথা প্রমথদাকে কেন সে জানায় নি? বিশেষ কোনো বাধায় নয় নিশ্চয়ই, খেয়াল হয় নি বলে, মনেই ছিল না বলে, শুভেন্দুর পরিচয় বা চিঠিপত্র মনে করে রাখবার মত কোনো প্রয়োজন কল্যাণী বোধ করে নি বলে।

নিরপরাধ নিশ্চিন্ততায় প্রমথর দিকে তাকাচ্ছে কল্যাণী।

প্রমথ বুঝছে, এই মেয়েটির প্রতিটি মুখের ভাব, চোখের দৃষ্টির মানে সে জানে, সাত-আট বছর ধরে একে কেটে-ছিঁড়ে, এর সম্বন্ধে আজ সম্পূর্ণ বিশেষজ্ঞতায় পৌঁছে গেছে সে।

শুভেন্দুর সঙ্গে কল্যাণীর উড়ো পরিচয় মাত্র, উড়ো চিঠির ব্যবহার মাত্র, কল্যাণী আজও প্রমথেরই জিনিস–বুঝতে দিচ্ছে মেয়েটি।

প্রমথ পরিতৃপ্ত হচ্ছে।

কিন্তু কেন এ কামনা আজও? কেনই বা এ চিন্তাহীন পরিতৃপ্তি? চার দিকে বিয়ে বাড়ির হুলুস্থুল, মানুষেরা আজ স্থূল জিনিস ছাড়া অন্য কোনো কিছু উপভোগ করবার কোনো রুচিও বোধ করছে না, অবসরও না; সে সবের প্রয়োজনও নেই তাদের; দু-তিন সপ্তাহের ভেতরেই প্রমথের বধূ হয়ে যে-মেয়েটি এই বাড়িতে পা দেবে–এবং সমস্ত জীবন ভরে সমাধানের সার্থকতায়, সমস্যার প্রয়োজনীয়তায় ব্যাপৃত করে রাখবে তাকে, সেই সুপ্রভা, আজই হয় তো, এখনই, এক দিনের স্টিমার ট্রেনের পথের ওপারে কেমন একটা পুলক নিয়ে প্রমথের জন্য অপেক্ষা করছে।

কিন্তু এই সব কিছুই প্রমথ ভাবতে যাচ্ছে না কেন?

জীবনের যেন কোনো দায়িত্ব নেই তার।

কল্যাণী যখন আসতে চাইল এখানে, কেন তাকে নিষেধ করে চিঠি দিতে পারল না প্রমথ? মেয়েটিকে কেন এখানে সে ডেকে আনল? প্রমথের জীবনের জন্য এ তো নয়, কল্যাণী তাকে খুবই ভালোবাসে বটে কিন্তু তবুও সামাজিক বিধি-ব্যবস্থাকে প্রমথ অনেকবার উপেক্ষা করতে চাইলেও শেষ পর্যন্ত কল্যাণী একবারও সাহস পেল না, কেন

পেল না? তেমন প্রেম এই মেয়েটির ছিল না বলেই হয় তো; কিংবা প্রেম, সে প্রেমও হয় তো ছিল, কিন্তু পৃথিবীর সামান্য উপকরণ নিয়ে পদে-পদে জীবনের তাড়া খেতে-খেতে দুটো প্রাণীকে অচিরে উচ্ছন্ন যাবার ভয়াবহ স্বপ্ন কল্যাণীকে হয় তো থামিয়ে রেখেছে; এ মেয়েটির সমস্ত ভালবাসার ভিতর দিয়েই পরিমাণবোধ জিনিসটা বেশ তীক্ষ্ণভাবে, তাজা হয়ে, চলে এসেছে; এক-এক সময়ে এর মাত্রাজ্ঞানের অন্যায় কঠোরতায় কষ্ট পেয়ে মনে হয়েছে–বাস্তবিক এ ভালবাসে কি?

ভালবাসে, ভালবাসে বটে, কিন্তু নিজের শরীরটাকে কোনো দিন প্রমথকে ছুঁতেও দিল না সে, প্রমথর বিয়েও সেই ঢের আগেই ঘটাতে পারলে ঘটাত–এখন ঘটছে যে সেই জন্য কল্যাণীই সবচেয়ে প্রসন্ন, নিজেও কল্যাণী সুবিধে পেলে আইবুড়ো হয়ে পড়ে থাকবে না যে এও প্রমথের কাছ থেকে গোপন রাখবার কোনো প্রয়োজন কোনো দিনই সে বোধ করে নি।

কল্যাণীর জীবনের এই তিনটি জিনিসকে প্রমথের স্বীকার করে নিতে হয়েছে–ওদের ভালবাসার সেই গোড়ার সময়ের থেকেই প্রায়।

বড় অদ্ভুত, বড় তামাসারই, তিনটি জিনিস; ভালবাসা ঐ জীবনের সজাগ পরিমাপ দিয়ে খুব নিখুঁত করে গড়া।

কল্যাণীর এ ভালবাসাকে কোনো বিচক্ষণ মানুষ একদিনের বেশি সইত না, প্রমথ না। অবোধ নয় প্রমথ, অনভিজ্ঞ নয়, অস্বাভাবিকতা অসাড়তা তিলমাত্র নেই তার ভিতর–জীবনের রগড় ও রসের প্রবল আকাঙ্ক্ষা একটি ফড়িং কীটের চেয়েও বেশি নয় তার, একটি নক্ষত্রের চেয়েও কম নয়–কিন্তু তবুও তো বেঁধে রেখেছে।

জীবনের কোনো স্থূল স্বাদই মেটাতে পারে নি কল্যাণী–কিন্তু চিন্তা ও কল্পনার ভিতরে কোনো অনুভূতিকেই জাগাতে সে বাকি রাখে নি; নিজের শরীরটাকে ব্যবহারে না লাগিয়েও শরীরের আস্বাদেরও অনির্বচনীয় প্রয়োজন যে-প্রেমিকের–বুঝতে দিয়েছে তা; সমস্ত পৃথিবীর ভিতর প্রেমিক যে এক জনেরই নাক-মুখ-ঠোঁট-চুল চায়–পৃথিবীর বাকি সমস্ত নারীসৌন্দর্য বা লাম্পট্য তার কাছে যে অত্যন্ত কদর্য কুৎসিত নিরর্থক, বুঝতে দিয়েছে তা। এই বোধের ভিতর নিরাশ্রয় ব্যথা–অপরিমেয় অমৃত।

বিয়েবাড়ির সমস্ত ফ্যাসাদ-ঝঞ্ঝাট ফেলে রেখে কল্যাণীর সঙ্গে দোতলার একটা নিরিবিলি কোঠায় দুপুর বেলাটা তাই একটু গল্প করতে এসেছিল প্রমথ। বেদনা পাচ্ছিল, আনন্দ পাচ্ছিল! জীবনের সাত-আটটা বিচ্ছিন্ন, ইতস্তত ছড়ানো বছরের জিনিসগুলোকে কুড়িয়ে এনে এক-একটা মুহূর্তের মধ্যে ভরে পাচ্ছিল যেন সে। এ সবের দরকার রয়েছে–মর্মান্তিক প্রয়োজন আজ; একটা নিদারুণ কদাকার হাতির শুঁড়ের মত জীবনের ভবিষ্যতের গতিবিধিটা প্রতি মুহূর্তেই যেন মাথার ওপরে দুলছে–কোথায় তাকে ছিটকে ফেলে দেয়, কল্যাণীকেই বা কোথায়? কে কাকে কোথায় খুঁজে পাবে তার পর জীবনের কুয়াশাবাতাসে দুজনেই হয় তো বিপরীত দিকে চলতে থাকবে এদের আর–এবং তাইতেই পরিতৃপ্তি থাকবে– ।

এই ভালবাসাটার দিক দিয়ে–তার নিজেরই অপরিহার্য নিয়মে এদের দুজনার জীবন এমন স্বাভাবিক ভাবেই অজ্ঞান হয়ে থাকবে এক দিন। এবং তাতে বেদনা তো দূরের কথা, কারুরই কোনো অসুবিধাও হবে না।

জীবনকে বরং ধন্যবাদই দেবে প্রমথও–মানুষকে সে এত স্থির হতে দিল বলে। কিংবা ধন্যবাদ দিতেও ভুলে যাবে হয় তো, নিজের সুস্থিরতা নিয়ে এতই আবিষ্ট হয়ে পড়বে সে। কিন্তু সে সব ঢের দূরের কথা।

কল্যাণী এখনও শূন্যতা নয়, কুয়াশাও নয়–পরিপূর্ণ মেয়ে। শুভেন্দু বরং এখন এখানে না এলেই পারত।

এই লোকটার মোটা কাণ্ডজ্ঞানের মেদ প্রমথকে.....

কিন্তু কল্যাণী একে অত ভদ্রতা করে ডাকতেই বা গেল কেন? ডেকে আনল তো, বসিয়েই বা রাখছে কেন?

কিংবা প্রমথর কাছে যা এত প্রয়োজনের, কল্যাণী তার বিশেষ কোনো দরকারই বোধ করছে না হয় তো; নিজেদের ভালবাসাকে–জীবনকে সে আর-কিছু মনে করে বসে রয়েছে; কল্পনার একটা আজগুবি কিছু।

নিরর্থকতায় বিরক্তিতে জ্বালায় শুভেন্দুর আপাদমস্তকের দিকে তাকাচ্ছে প্রমথ। কিন্তু এই লোকটা থাকবেই।

কল্যাণীও তাতে অস্বস্তি বোধ করছে না। যেন জীবনের শেষ প্রয়োজনের শেষ রাত্রির নিভৃত মুহূর্তের কোনো গোপনতা নেই,–সেই মুহূর্তই নেই–সেই রাত্রিই নেই–সে-সবের কোনো প্রয়োজনই কারু কোথাও থাকতে পারে না যেন; মানুষের জীবনের পাঠ এর একেবারেই অন্য রকম-ছেলেমানুষির টোকা দুধের গন্ধে মর্মান্তিক।

কিন্তু তবুও উঠতে পারা যাচ্ছে না।

বসেই থাকতে হচ্ছে–পুরুষমানুষ যে-বয়সে বাস্তবিকভাবে প্রথম ভালবাসতে আরম্ভ করে, এই মেয়েটিকে তখনই ভালবেসে এনে নিজের জীবনে বসিয়ে রাখবার সুযোগ পেয়েছিল প্রমথ–পুরুষের ভালবাসা যে বয়সে সত্যিই শেষ হয়ে যেতে থাকে, তার সীমানায়ও এই মেয়েটিকে সেই জায়গায়ই দেখতে পাচ্ছে প্রমথ-এই মেয়েটিকে নিয়েই প্রমথের জীবনের প্রধান ভালবাসার প্রথম ও শেষ; এর পর যে-সব প্রণয় ও আকাঙ্ক্ষা আসবে, জীবনে বিচারকে তা এত অভিভূত করে রাখতে পারবে না–কিন্তু এখনো জ্ঞান কিছু নয়; দৃষ্টি, বিচার সমস্তই আজও প্রেমের আচ্ছন্নতায় লিপ্ত হয়ে একটু রগড় করবারও সুযোগ পাচ্ছে না। এই মেয়েটাকে একটু ঠাট্টা দিয়ে বেঁধা, নিজেকে খানিকটা উপহাসাস্পদ করে দেখানো, শুভেন্দুর মত গরুর ঠ্যাংকে কল্যাণীর মত বিড়াল ছানার নিষ্কলঙ্ক নির্বুদ্ধির কাছে ছেড়ে দিয়ে চলে যাবার মত একটা বিস্তৃত তামাসা বোধের শক্তি–জীবনে এসব কখনো আসে নি।

প্রেম এখনও; অভিজ্ঞতা ও কাণ্ডজ্ঞানের ভাঁড়ামি পরে।

কিন্তু হাতড়ে সে গুলোকে যদি এখনই পাওয়া যেত; হায়! কিন্তু যখন পাওয়া যাবে বহু অগ্রসরগ্রস্ত জীবনের স্নিগ্ধ রুচির ভিতর সেগুলোকে ব্যবহার করবার ইচ্ছে হবে না আর, নির্জনে নিজের মনকে দু দণ্ডের আমোদ দেওয়া চলবে মাত্র–

শুভেন্দু বললে, 'তুমি হয় তো অবাক হয়ে ভাবছ কল্যাণীর সঙ্গে আমার কোথায় আলাপ হল–এত খানিই বা কী করে হল–'

কল্যাণী বললে, 'আমি কী বলি নি তোমাকে প্রমথদা? আমার মনে পড়ছে না কিছু–'

শুভেন্দু বললে, 'আলাপ হল এদের বারাকপুরের বাড়িতে কল্যাণীর দিদি–' সুরমাদির বিয়েতে; সেখানে তোমাকে দেখি নি তো প্রমথ, প্রত্যাশাও করি নি, তোমার কথা মনেও হয় নি–হবেই বা কী করে? কল্যাণীদের সঙ্গে তোমার এত আলাপ কে বুঝবে বাবা বল?'

শুভেন্দু বললে, 'কিন্তু তুমি সুরমাদির বিয়েতে যাও নি কেন?'

কল্যাণীকে বললে, 'চিঠি দাও নি?'

–'দিয়েছিলাম'

–'তবে?'

কল্যাণী বললে, 'প্রমথদা বড় একটা যায় না কোথাও; দেখুন না, নিতান্ত নিজের বিয়ে, তাই রাজশাহি অব্দি যেতে হবে সশরীরে; কিন্তু বদলে যদি কাউকে দিয়ে কাজ চালানো যেত তা হলে এখান থেকে এক পাও নড়াতে পারতেন না প্রমথদাকে; দেখুন এও শেষ পর্যন্ত যায় কি না।'

শুভেন্দু হো হো করে হেসে উঠছে।

আমোদ পেয়ে বলছে, 'ও, সেই জন্য বুঝি যায় নি সুরমাদির বিয়েতে–'

প্রবলভাবে ঘাড় নেড়ে বললে, 'কিন্তু, আমি কিন্তু বাবা বিয়ে আচ্ছা কভি নেই চোরেঙ্গে। একেই তো নানা ঝঞ্ঝাটে মানুষের দুর্বিসহ জীবন, তার পর এই মুহূর্তগুলো, ভাই, বিয়েই হোক বা শ্রাদ্ধই হোক, জন্মদিন অন্নপ্রাশন চূড়োকরণ যাই হোক্ না কেন, আসবি তো বাবা চটপট এসে পড়, না সেই ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে-ঢিমিয়ে-তাও যদি প্রতিটিতে নেমন্তন্ন চিঠি পাওয়া যেত; এও এক বিভ্রাট–'

প্রমথর দিকে তাকিয়ে, 'বড় দয়া করেই আমাকে শ্রীহস্তে কিছু লিখে দিয়েছিল ভাই প্রমথ, শুভবিবাহের ফর্ম্যাল চিঠি পেলেই আমি যেন চলে আসি–'

হঠাৎ (কল্যাণীর কাছে) নিজের অতিরিক্ত বাচালতা আবিষ্কার করে ফেলে একটু থমকে গিয়ে বললে শুভেন্দু, 'সুরমাদিরা কিন্তু আমাকে চিঠি দেন নি।'

শুভেন্দু প্রমথর দিকে তাকিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, সুরমাদির বর আমার পিসতুতো ভাই–'

প্রমথ বললে, 'তোমারই ভাই?'

–'আপন পিসতুতো; সেই সূত্রেই যাওয়া; দাদার বিয়ের বরযাত্রী; যা মজাটাই মেরেছিলাম– জিজ্ঞেস করো কল্যাণীকে–'

অতিরিক্ত অন্তরঙ্গতায় কল্যাণী একটু অস্বস্তি বোধ করছিল হয় তো; কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হচ্ছিল না তার; একটু নড়েচড়ে বসে বললে, 'আমাকে কেন জিজ্ঞাসা, শুভেন্দুবাবু! আমাদের মেয়েমহলের স্ফূর্তির আপনারাও জানেন নি কিছু, আপনাদেরটাও, দুর্ভাগ্যক্রমে, কিংবা বড় সৌভাগ্যই বলতে হবে, আমরা উপভোগ করতে পারি নি–'

–'ঐ তো বুঝলে প্রমথ–শুনলে? কল্যাণী বলছে আমাদেরটা সম্ভোগ করবার তেমন সৌভাগ্য হয় নি তাদের, তারও হয় নি; ঠেস দিয়ে কথা বলতে চাচ্ছে; উদ্দেশ্য, উপহাস–তা হবে না? সমস্ত বারাকপুর আমরা বরযাত্রী পুরুষের দল মাথায় করে নিয়ে ছিলাম না! মেয়েরা সে সবের কী বুঝবে–'

–'থামুন, থামুন, নেহাত বিয়েটা ঠিক হয়ে গিয়েছিল বলে, নইলে আলিপুরের যে-দল এসেছিল বারাকপুরের বাগানে–'

এমনি করেই চলছে এদের কথা।

দুজনেই উপভোগ করছে প্রচুর।

পুরনো কথা মনে পড়ছে সব। দু বছর আগের স্মৃতিগুলো সমস্ত। এত দিন পরে হঠাৎ আজ সম্মিলিত হতে গিয়ে এদের মনের ভিতর কোথাও কোনো খোঁচ নেই যেন আর। কথায় আলাপে পরস্পরকে খোঁচা দিয়েও যথেষ্ট আরামই পাওয়া যাচ্ছে যেন, যেন এই উপভোগের থেকে অন্য কোনো অবান্তরের ভিতর সহসা এরা কেউ ডুবে যেতে চায় না, এরা রীতিমত পাচ্ছে।

প্রমথ অনেক ভেবেচিন্তে, বিয়ে বাড়ির ঢের ফ্যাকরা ছিঁড়ে একটা নিরালা ঘর খুঁজে, আজ দুপুরবেলা যে-প্রয়োজনে কল্যাণীকে নিয়ে বসেছিল এসে মাত্র–সেই ব্যাপারটার আগাগোড়াটাকে একটা অনর্থক টঙে দাঁড় করাচ্ছে যেন কে; কে? কল্যাণী? শুভেন্দু? প্রমথ নিজে?

কিছু বুঝে উঠতে পারা যাচ্ছে না।

চুরুটটা? কিন্তু থাক।

কিন্তু কী নিয়ে থাকবে সে?

এদের কথা শুনবে?

কল্যাণীর কথাবার্তা মর্মাহত করছে না প্রমথকে–শুভেন্দুও তাকে পাগল করে তুলছে না, ওদের দুজনের ভিতর আর-যাই থাক, ভালবাসার কোনো অঙ্কুর নেই–কথা, গল্প, দুষ্টুমি ও ধাষ্টোমির বিমুগ্ধতা রয়েছে শুধু, বিমুগ্ধতা রয়েছে। কিন্তু যাই করা হোক না কেন, পরস্পরের সান্নিধ্যে থেকে পরস্পর বিমুগ্ধ হয়ে থাকছে তো এরা।

সেও এই মুগ্ধতাই চায়, কল্যাণীকে নিয়ে, নিজেকে নিয়ে, বিনা আড়ম্বরে এদের মত বিমুগ্ধ হয়ে পড়বার মত জীবনের সমারোহ আজ আর নেই যেন তার, কল্যাণীর সঙ্গে ভালবাসার কথা বলে জীবনের আড়ম্বর তৈরি করতে চায় সে, মুগ্ধতা পেতে চায়, দুই মুহূর্তের জন্যই, তাও হোক–তাও হোক। তার পর একটা দারুণ দায়িত্বপূর্ণ জীবনের চাপে কিছুরই সময় হবে না আর।

শুভেন্দু বললে, 'প্রথম তোমার সঙ্গে কী করে আলাপ হল কল্যাণীর আমিই ভুলে যাচ্ছি।'

কল্যাণী বললে, 'আপনি তো সব সময়ই সকলের সঙ্গে আলাপ করছিলেন, আপনার প্রথম আর শেষ কোথায়?'

–'তোমাকে মিস গুপ্ত বলেও ডাকতাম, কী বেকুবি–'

প্রমথ বললে–'বেকুবি তোমার এখনই হচ্ছে শুভেন্দু।'

–'আমার?'

–'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।'

একটু দমে না গিয়ে শুভেন্দু বললে, 'বা, বৌদির বোনের সঙ্গে আলাপ করব না? আমি ওর জামাইবাবুর ছোট ভাই–'

শুভেন্দু বললে, 'সুরমাদির বিয়েতে তো তুমি যাও নি, গেলে বুঝতে এরা আমাদের সঙ্গে কী রকম ভাবে মিশেছে।'

–'ওরা কারা শুভেন্দু?'

–'কেন, কন্যাপক্ষ?'

প্রমথ শুরু করলে, 'কন্যাপক্ষ তোমাদের সঙ্গে বিয়ের সময় যা খুশি করুক গে–' কিন্তু কল্যাণীর দিকে তাকিয়ে থেমে যাচ্ছে প্রমথ–

শুভেন্দু বললে, 'যদি ওর নাম ধরে ডেকে আমি বেয়াদবি করে থাকি, উনিই বলুন।'

কল্যাণী বললে, 'আপনি আমাকে নাম ধরে ডাকলেও কিছু হবে না–তুমি বললেও কিছু এসে যাবে না; জামাইবাবু তো সবই করেন! দুষ্টুমি করে চুল ধরে টানেন, আমিও ওর গাল খিমচে দিতে ছাড়ি না, উনি পাল্টে নাক ডলে দেন, আমি তখন কানে হাত দেই, উনি তখন আমার দু গালের মাংস ছিঁড়ে ফেলেন কি আমি ওর ছিঁড়ি–'

প্রমথ স্তম্ভিত হয়ে বললে, 'সত্যি কল্যাণী?'

শুভেন্দু বললে, 'রগড়-তামাসা আমাদের পরিবারের রক্তে, মায়ের দিক থেকে পেয়েছি, ললিতদা পেয়েছেন তার বাপের দিক থেকে; ললিতদার ঠাকুর্দা, আমার দাদামশায়ের, ভাঁড়ামোতে সেকেলে নবাবের বাড়িতে তার খুব খাতির ছিল, বাস্তবিক ফুর্তি বোঝে মোসলমান–'

প্রমথ চুপ করে ভাবছে। কে সে সৌভাগ্যবান ললিত বাবু–কল্যাণীর চুল ছিঁড়ে, গালের মাংস খেয়ে হয় তো এর দুর্লভ শরীরটাকে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে যদেচ্ছাক্রমে ব্যবহার করেও, এই মেয়েটির সবিশেষ ভদ্রতাবোধকে যে না পারছে বিন্দুমাত্র আঘাত করতে, না হচ্ছে একটুও কলঙ্কিত ব্যথিত, এই মেয়েটির শরীরের উপরও এমন অব্যাহত অধিকার যার, হায়, এর দেহের তুচ্ছাতিতুচ্ছ একটি রোমের রস উপলব্ধি করবার ক্ষমতাও তবু যার নাই। বিধাতা এমনই অপ্রার্থিত জায়গায় গিয়ে কি তার সুধার ভাণ্ড ভাঙেন?

এক মুহূর্তের জন্য একটু তামাসা বোধ হচ্ছে প্রমথের। কিন্তু দিদির জামাইয়ের জায়গায়, নিজের জামাই যখন এর আসবে–ভাবতে গিয়েই প্রবল একটা কুম্ভীপাকের বেদনায় ঘুরপাক খাচ্ছে যেন প্রমথ।

স্বামীর সম্ভাবনা নিয়ে যে–কেউ আসবে নির্বিবাদে তো কল্যাণী তাকে দিয়ে দেবে, হয় তো সে এ শরীরের প্রতি এক মুহূর্তেরও লোভ না করতেই; কিন্তু জীবনের ছ-সাতটা মূল্যবান বছরের দিন গুনে-গুনে যত আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস, কুহকের সূক্ষ্মতা (কল্যাণীর শরীরের দিকটাই যদি ধরা যায় শুধু), ওর জন্য জমিয়েছে প্রমথ, সমস্তই নিজের রক্তটাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে তার, যৌবনটাকে অকর্মণ্য, জীবনটাকে নিরর্থক, আত্মাকে দিয়ে অপচয় করাচ্ছে শুধু, মাকড়সার পেটের নরম রোমের রাশ দিয়ে কুড়িটাকে গেলাচ্ছে শুধু, যে কুড়িটা মৌমাছিকে পেত, ফড়িঙকে, প্রজাপতিকে, আলোকে, আকাশকে।

এই মেয়েটার সমস্ত মসৃণ সুন্দর শরীরটাকে কবে সে মাকড়সার পেটের চটপটে সুতোর গুটিপাকানো ডিম মাত্র মনে করতে পারবে–তেমনই দুর্বৃত্ত, অশ্লীল, কদর্য, বীভৎস!

এখনো যে এর মোহ, মোহই বা বলে কেন প্রমথ, ধর্মের মত এর মাদকতা, দেবতার মত পবিত্রতা, ভগবানের রাজ্যের মত অনির্বচনীয়তা তার, প্রমথকে কল্যাণীর দেহ ধর্মোন্মত্ত করে তুলেছে? ওর আত্মা কি ওর শরীরের চেয়েও পূজ্য? কে বলে, এই সুন্দরকে দেখে নি সে তা হলে! এর মুখের ওপর, ভুরুর ওপর, ঠোঁটের ওর প্রমথ তার

চোখের দৃষ্টিটাকে আবেগপ্রবণ চুমোর মত চেপে দিয়ে কতবার বলেছে প্রেম, সুন্দরের থেকে শরীরকে কী করে ছাড়াবে? পৃথিবীর কোথায় কী হয় জানে না প্রমথ, কিন্তু কল্যাণীর সুন্দরী শরীরই ওর আত্মা, ওর মন, ওর অনুপম মোহের সৌন্দর্য দিয়ে গড়া, ভগবান, তাই দিয়েই গড়া শুধু, বিধাতা, পৃথিবীর এই একমাত্র মেয়েমানুষকে এই রকম করে গড়েই ভাল করেছ তুমি।

কিন্তু এমন অনুভবের পরিপূর্ণ সময় চলে যাচ্ছে তার। দুটো বছর যাক, একটা বছর হয় তো, হয় তো অতদিনও না, চলে যাক, তার পর নিজের এই অপরূপ উপলব্ধির থেকে ঢের দূরে সরে যাবে সে।

এ অনুভবের অনেক খুঁটিনাটিই সে হারিয়ে ফেলবে–আবেগপ্রবণ এমন জীবন থাকবে না আর, না কামনার জন্য না ভালবাসার জন্য।

প্রেমের এই বিস্তৃত গভীর অর্থ সে হারিয়ে ফেলবে।

জীবনে প্রেম থাকবে না তখন আর; আকাঙ্ক্ষারও কোনো নিগূঢ় গাঢ়তা থাকবে না; স্থূল একটা ক্ষিদে মাঝে-মাঝে জেগে উঠে নিভে যাবে মাত্র; সৌন্দর্যকেও তখন মেদ বলে মনে হবে শুধু; সে বাতাসে ভালবাসা বেঁচে থাকতে পারে না।

যখন জীবন সব রকমেই তৈরি হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল–কল্যাণীকে পছন্দ করতে গেল কেন প্রমথ?

একে ভালবাসতে গেল কেন? হায়, পরিপূর্ণ পাখিটাকে তৈরি করে পাঁকের ভিতর ফেলে দেওয়া? ফুলটাকে বিছের ডিম বিছের বাচ্চা দিয়ে খাওয়ানো? কল্যাণীদের বারাকপুরের বিয়েবাড়ির বর্ণনা এখনো চলছে।

কিংবা কথাটা অন্য কোনো দিকে ঘুরে চলেছে হয় তো।

যাই হোক, এরা খুব ব্যাপৃত রয়েছে; সাংসারিক জীবনের আটপৌরে আঁট-সাঁটের কথায় কল্যাণী খুব সহজেই প্রবেশ করতে পারে- নানা দিক দিয়েই নিজের জীবনের আটপটা এ বেশ বোধ করে– বৈঠক যেমন ভাল লাগে এর, কাজও তেমন, ফুর্তিও যেমন, আমোদপ্রমোদও তেমন; শুধু চিন্তার মুখোমুখি হয়ে এ ছেলেমানুষ হয়ে পড়ে, ভাবতে চায় না, তেমন ভাবে অনুভব করতেও ভয় পায়, নিজেকে ধরতে পারে না, অপরকে ধারণা করতে গিয়ে পিছিয়ে যায়, চোখ কপালে তুলে ভাবতে বসলে একে বড় কুৎসিত দেখায়, বড় শূন্য; প্রমথের প্রতি কথায়ও তবু একে ভাবতে হয় যে। এর স্বাভাবিক জীবনের স্বচ্ছন্দতার চাবিও প্রমথের কাছে আছে বটে কিন্তু সেটাকে প্রমথ বড় একটা খাটাতে চায় না।

কল্যাণীর সঙ্গে বিয়েবাড়ির বা শাড়ির বা হাঁড়ির গপ্প করে কী হবে? সে সব মানুষকে কোথাও পৌঁছিয়ে দেয় না।

সে ভালবাসার পথের যাত্রী–বাস্তবিক জীবনে যে-মেয়েটির সঙ্গে সঙ্গম এত কম, যে মেয়েটি আজীবন বিদেশের প্রদেশে-প্রদেশেই কাটাল শুধু, কাটাবে শুধু, হাতের কাছে পেয়ে তাকে পাঁচাল করতে ভাল লাগে না, এর রূপের কথা শোনাতে ইচ্ছে করে একে, মানুষের জীবনে রূপের স্থান কোথায়, ভালবাসার সঙ্গে রূপের কী যোগ, নিতান্ত শরীরেই বা কতটুকু; ভালবাসার পথের পরিপূর্ণ অর্থটুকু কী, বাস্তবিক প্রেম কী-ই যে, এর সূচনা কোথায়, পরিণামই বা কতদূর, কোথায়ই বা ব্যথা তার, তার ঈর্ষা, হিংসা

তার, তার শ্লেষ, দৌরাত্ম্য, দুরাচার, মাদকতা, উল্লাস, অমৃত, তারপর কুয়াশা, তার শীত, তার মৃত্যু।

জীবনের পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবিতা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে। পরিবর্তনকে ভয় পায় কল্যাণী, এক-এক সময় কৌতূহল দিয়ে ধারণা করতে চায়–পরিবর্তনকে ও স্বীকার করে না, প্রমথের সন্দেহ ওকে কষ্ট দেয়, প্রমথের অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা, পরিবর্তন সম্বন্ধে হৃদয়হীন অতিচার, ওর কাছে বর্বরতা মনে হয়; মুখে কিছু বলে না সে, কিন্তু প্রমথের সমস্ত মতামতের পরেও কল্যাণী তার একটি সত্যকেও ক্ষুণ্ন করে বুঝে দেখতে কষ্ট পায়, কিন্তু তবুও সেই ফ্রকপরা খুকির থেকে আজ এই আঠার বছরের মেয়ের জীবনের যে একটা গোপন ব্যবধান টের পাচ্ছে প্রমথ–তারই কুয়াশার নীচে-নীচে প্রমথের ইতস্তত ছড়ানো চিঠি ও কথার ছেঁড়া টুকরোগুলো জীবনের অঙ্কুর পেয়ে ফুঁড়ে উঠছে যেন, ওর মনকে আঘাত করে অনাবিষ্কৃত বিস্ময়ের মত তারই এক একটা চমক অনুভব করতে এত লাগে প্রমথের।

কিন্তু তবুও অন্য কারো জন্য ওকে তৈরি করে দিয়ে গেল শুধু প্রমথ। ফসল যেদিন আসবে সে দিন চাষীকে আর পাবে না কল্যাণী; যে [?] আসবে কে জানে, সে এই সোনাকে কী রকম ভাবে উপভোগ করবে; এগুলোকে আঁটিমাত্র মনে করবে, না রং, না রস, না অনুভূতি? ইঁদুর পেঁচা পঙ্গপাল গাড়ল শুয়ার মানুষ–জীবনের সঞ্চিত সোনার ছড়ার বিস্তৃত মানে এদের কাছ।

শুভেন্দু সাদাসিধে পাঁচালি নিয়ে বসেছে।

মেয়েটাকে তার দুর্বল জায়গায় হাত বুলিয়ে আটকে রাখছে। প্রমথও পাল্টা পাঁচালি পড়তে পারে– কমললোচন মোটর কোম্পানির–দুই গোছা দিয়েই শুরু করুক না, কল্যাণীকে নাড়ীর প্যাঁচের সঙ্গে বেঁধে রাখতে পারবে যেন, বৈঠক শুরু করলে শত শুভেন্দুর সাধ্য নেই প্রমথকে হটায়–এই মেয়েটাকে খসায়!

কিন্তু ধ্যেৎ।–ও-সবের জায়গা আলাদা, কল্যাণীর সঙ্গে আজ নয় অন্তত, এখন নয়। এই মুহূর্তের প্রয়োজন একেবাইরে অন্য রকম- পাঁচালি মানুষকে যেই জায়গা দিয়ে শুরু করায় সেই জায়গায়ই রেখে চলে যায়, আজ পুলক চাচ্ছে প্রমথ, কল্যাণীকে বাছা-বাছা জায়গায় আঘাত করে চমক চাচ্ছে সে শুধু।

কিন্তু এরা বৈঠক অধিকার করে বসেছে; নড়বে না।

নিস্তব্ধ প্রমথের দিকে কোনো খেয়ালও নেই এদের।

বিয়েবাড়ির কাজ বয়ে যাচ্ছে–কিংক কাজ সামলাবার লোক যদি থেকে থাকে তো–তবুও, তা হলেও, এখান থেকে উঠে গিয়ে কোনো এক বৈঠকে তাস হাতে তুলে শান্তি আছে।

ডেক-চেয়ার থেকে আলগোছে (পেছনের দরজাটা দিয়ে) সরে পড়ে যদি প্রমথ, শুভেন্দুও বুঝবে না– কল্যাণীও না।

ছায়ানট

আকাশের দিকে চেয়ে কাটিয়েছি অনেক দিন। বাইরে বাইরে।... কিন্তু ঘরে ঢুকতে হয়েছিল যে।

বিদায় নিলুম, -আকাশ আলোর দিকে ভালো করে তাকাবারও ভরসা হ'ত না। চমকে উঠতুম,– ঐ নগ্ন আলোর মুখ দেখে - আর ঐ অত বড় অতখানা আকাশ...

দরজা-জানলা বন্ধ।

বিছানায় শুয়েছিলুম।

রেবা মাথা টিপছিল।

আমি তাকে টিপতে বলেছিলাম। এমনতর আব্দার আজকাল প্রায়ই করি।

যদিও কোনো সাড়াই পাওয়া যায় না।

'অত আস্তে মাথা টিপলে চলে কি?'

রেবা কোনো জবাব দিলে না।

'আর একটু জোর দাও। হ্যাঁ, ঠিক এই রকম।'

তা মুখের দিকে তাকাতে গেলুম।

ঘাড় ফিরিয়ে নিয়েছে।

'হ্যাঁ, ঠিক এইরকম,– ঠিক এমনি... বেশ লাগছে- আ-'

আঙুর মুষড়ে যখন মদের পেয়ালা ভ'রে নেই, -তখনো তো বেশ লাগে,

-আমার।

কিন্তু আঙুরের!

মাটির থেকে কিছু পেতে হ'লে মাটির বুকটাই-না আগে চিরে নিতে হয়।

পেলামই না-হয় দু'মুঠো ভ'রে।

কিন্তু তার জন্যে কতখানি আঁচড়, -কত বড় ক্ষতের চিহ্ন!... তার মাথা টেপাটা আমার ভালো লাগছিল না। সে যত বেশি আপনাকে খরচ করতে যাচ্ছিল আমার দেউলে হবার সম্ভাবনা যাচ্ছিল তত বেশি বেড়ে।

'থাক্,– আর টিপতে হবে না।'

কথাটা শুনতে পায়নি যেন।

'রেবা,– হয়েছে।'

এবার উঠল।

দাঁড়াল,-চাবির রিং-টা ঘুরিয়ে; -বেঁচেছে বৈকি।

আমিও বাঁচলাম। হাঁফ ধ'রে গিয়েছিল।

চশমার পুরু কাঁচের ভিতর দিয়ে রেবার মুখের পানে তাকিয়ে আরেক বার চিনে নিলুম, -আমাকে আর তাকে।

কত খুঁটিনাটির ভিতরই যে আমরা ধরা প'ড়ে যাচ্ছি।